বাংলার ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

শশাঙ্ক মণ্ডল

পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী— বৃহত্তর হিন্দু সমাজের পাশে এদের বাস। কিন্তু প্রতিবেশী সম্পর্কে এক ধরনের অজ্ঞতা, কিছুটা সংশয় ও সন্দিগ্ধচিত্ততা হিন্দু সমাজের মানুষদের, এদের প্রতি উদাসীন করে তোলে। প্রচলিত কয়েকটি শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজকে বোঝার চেষ্টা হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি বাস, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, একই জমির এপাশে ওপাশে কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত, রাত জেগে শস্য পাহারা দেওয়া কিংবা একই কারখানার শেডের তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কিন্তু তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানরা তবু হিন্দু সমাজের অনেক কিছু জানে— তার সরস্বতী পূজা, দুর্গা পূজা, বিবাহ রীতি নীতি সম্পর্কে মুসলমানদের কিছুটা ধারণা আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। দুঃখের হলেও সত্য বাঙালী হিন্দু ও মুসলামান এর মধ্যে একটা ভেদ রেখা দুজনকে দুদিকে রেখে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র ধর্মকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অর্থনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী হিন্দু - মুসলামনের মধ্যে কোনো বিশেষ তফাৎ নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথা সম্প্রদায়গত অবস্থানের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের প্রাচীরের অপর পারে প্রবেশ করে তাকে বোঝার কোন সচেতন প্রচেষ্টা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে কয়েকটি বাঁধাধরা ভাবনার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে জানা ও বোঝার পর্ব শেষ হয় হিন্দুদের—মসজিদ তার অজানা, দূর থেকে মাইকের মধ্য দিয়ে আজানের শব্দ ভেসে আসে, ঈদ, নামাজ, হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণকারী, তালাক, সুন্নত এ ধরনের কতকগুলি বিষয়ের কিছু ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আমাদের জানা শেষ হয়— এর ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমান সমাজকে বোঝার চেষ্টা করি। অপরদিকে মুসলমানরাও প্রতিনিয়ত তাদের গোষ্ঠী মানুষদের ধর্মের নিরিখে সংঘবদ্ধ করে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে এনে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সে তার জীবন নির্বাহ করে;প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ সম্পর্কে একধরনের উদাসীনতা তাকে পেয়ে বসে।

সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভেদা রেখা আছে, তা অনেকটা লক্ষণরেখার মতো পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুরু মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে; তার বাগধারা, রীতিনীতি, কাহিনী নির্মাণ, কাহিনীর উৎস, আঙ্গিক, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংস্কৃত নির্ভরতা সবটা মিলিয়ে এক ধরনের হিন্দুয়ানা প্রথম থেকে বাঙলা সাহিত্যে ছিল, আবার এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের উন্নাসিকতা তাকে সাহিত্যের এই পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল—আরবী ফার্সি, উর্দু ভাষার মধ্যে তার চিত্ত মুক্তি খুঁজতে চেয়েছিল। এর আগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। হিন্দু সমাজের অভিজাত্যের প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করেছিল বাংলায় মুসলমান আক্রমণ। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বিজাতীয় আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রৌরব নরকের ভীতিকে অস্বীকার করে হিন্দু সমাজের ওপরতলাকার কিছু কবি সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন— সেই যুগে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিল সমাজের বর্ণ বিভাগের নিয়মানুযায়ী উচু বর্ণের মানুষরা। ইসলাম ধর্মান্তরিত দেশজ মানুষরা শিক্ষা - সংস্কৃতির বিচারে ছিল এতেবারে প্রাথমিক স্তরে, ফলে এরা - দীর্ঘকাল পর্যন্ত লোক - সাহিত্যের বৃত্তের বাইরে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারেনি। অপরদিকে মুসলমান অভিজাতরা সেদিন বাংলাভাষার প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধ পোষণ করতো। নিজেদের অভিজাত্য প্রকাশের জন্য উর্দু, ফার্সি - আরবি ভাষাকে অবলম্বন করে তাদের সাহিত্যচর্চা - জ্ঞানচর্চা সীমিত ছিল। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীকে কিছু কবি, সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছিলেন দ্বিধা সত্ত্বেও। ফরাসী প্রণয়োপাখ্যান বাংলা ভাষায় রচনার মধ্য দিয়ে এরা সাহিত্য চর্চা করেছেন। সেই সাথে রামায়ণ, মহাভারত, আরবি - ফারসী সাহিত্যে বর্ণিত পয়গম্বর ও তাঁর সহযোগীদের জীবন কাহিনী, নবীকথা অবলম্বনে কেচ্ছা কাহিনী রচনা করেছেন। তারা বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি দীর্ঘকাল উপস্থিতি খুবই কম। নিঃসন্দেহে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী জনপ্রিয় লেখক এ বাংলায় পাঠক চিত্তে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছেন— অতীতেও এ ধরনের লেখক অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু সংখ্যার বিচারে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক অংশ।

হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতির মিলনের অজস্র নজীর রয়েছে, উভয় সম্প্রদায় পরস্পর আদান - প্রদানের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট উপকৃত ও প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু তার পাশে একটা বিভাজন রেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে শুধু ব্রিটিশের ভেদ - রাজনীতি 'ডিভাইড এন্ড রুল' -এর কথা বলে লাভ নেই। ধর্ম মাঝখানে এসে উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ধর্ম যতই সার্বজনীন বিশ্ব মানবতার কথা বলুক, অপর ধর্মের প্রতি সহনশীলতার কথা ঘোষণা করুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মে ধর্মে বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে— ধর্মের মধ্যে এক ধরনের সংকীর্ণতা শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। বিবেকানন্দ যতই বলুন— বাইবেল তোমাকে খ্রীষ্টান হতে বলেনি, কোরান তোমাকে মুসলমান হতে বলেনি—গীতা তোমাকে হিন্দু হতে বলেনি- সব ধর্মের সার কথা ''হে মানুষ তুমি মানুষ হও।'' পৃথিবীর সব ধর্মীয় নেতা এ ধরনের উদার মানবিকতার কথা বলেন কিন্তু ধর্ম তো আর শুধু ''ধর্মই থাকে না, তার সাথে মোহ এসে জোটে কিংবা রাজনীতি তার সংকীর্ণতা, দলীয়তা নিয়ে দেখা দেয়। শুরু হয় ধর্মে ধর্মে সংঘাত। প্রতিটি ধর্ম তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে অপর ধর্মের মানুষের সাথে বিরোধ বজায় রাখতে গিয়ে অপর ধর্মের মানুষের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।'' ধর্ম যতই বিশ্ব মানবতার কথা বলুক তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে একটা ধর্মীয় সংকীর্ণতাবোধ ফলে, পৃথক পৃথক ধর্মকে কেন্দ্র করে এই সংকীর্ণতা - বোধ বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে, সংস্কৃতিতে পৃথক পৃথক রূপ স্পষ্ট হয়— বিভাজন রেখা তৈরী হয়। ভারততীর্থ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন— ' পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' —রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য মেনে নিতে কষ্ট হয় এবং এই স্পর্ধার জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি 'লীন' হলেও সমস্যা ছিল না— এই বিরোধ থাকার কথা ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকে যদি তার স্বাতন্ত্র্য খোঁজার চেষ্টা করে তাহলে তো সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং যথাসময়ে তা বেড়ে যায়। ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা তা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত জন সংখ্যা ধরা হয়েছিল ১০০ কোটি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে আফ্রিকা, বিস্তীর্ণ এশিয়া মহাদেশ, সুদূর অষ্ট্রেলিয়া - নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, এক কথায় সারা পৃথিবী জুড়ে ৪৫টি দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। আমাদের দেশেও এরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতে স্বীকৃত। একশ কোটি মানুষের মধ্যে ত্রিশ কোটি মুসলামান সংখ্যালঘু হিসাবে বিভিন্ন দেশে বাস করেন। পৃথিবীতে মুসলমান অধ্যুষিত প্রধান জনসংখ্যার দেশগুলি হলো— ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, ইরান, আফগানিস্তান, মরক্কো, আলজেরিয়া, সুদান, তানজানিয়া, ইরাক, সৌদি আরব, উত্তর ইয়েমেন, সিরিয়া, মোজাম্বিক, মালয়েশিয়া, টিউনেশিয়া, ও মালি। এই কুড়িটি দেশ পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তারা আছে। কেউ ধর্ম

নিরপেক্ষ কেউ ইসলামী, কেউ সমাজতান্ত্রিক, আবার কেউ গণতান্ত্রিক ধ্যান - ধারণা নিয়ে শাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছে। পৃথিবীতে রাজনীতির বিচারে এরা কেউ আমেরিকার পক্ষে, কেউ ছিল সাবেক সোভিয়েত ব্লকে, আবার কেউ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমুহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের মিল— প্রতিদিন তারা কাবার দিকে মুখ করে ঘোষণা করে আল্লাহ্ আকবর— আল্লাহ্ -ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

যুগে যুগে সেই প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে কত মানবগোষ্ঠী ভারতে এসে জনজীবনের সাথে মিশে গেছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশে অভিযান চালায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। পাঠান মোঘলরা শাসক হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক জগতে আর্বিভূত হলো। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর শাসনকালে তা মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নানা কারণে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। আর সেই সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মান্তরীকরণের মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষ এদের সাথে যুক্ত হওয়ায় এক বিশাল ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। প্রাক ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশে হিন্দু - মুসলমানের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ভারতে এর আগে অনেক অঞ্চল বাংলার পূর্বেই ইসলামের অধিকারে এসেছে কিন্তু সে সব জায়গায় বাংলার মতো এতো বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— বাংলার এতো বেশী সংখ্যক মানুষ কিভাবে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো। এরা কি বহিরাগত অথবা দেশজ মুসলমান এ ব্যাপারে নানা পন্ডিত নানা কারণ খুঁজেছেন। অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন — জোর জবরদস্তি নিপীড়ন ও অস্ত্রের সাহায্যে অসহায় মানুষদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। ভারতের অন্যত্র বাংলার অনেক আগেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শাসক হয়েছেন কিন্তু সে সব জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বাংলার মতো ঘটেনি। লক্ষ্ণৌ ভারতের মুসলমান আধিপত্যের একটা পুরানো কেন্দ্র, কিন্তু সে ভাবে এখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায় না। মুসলমান, তাদের সন্তান সন্ততিরা মিলে মিশে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের শুরুতে এক বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেল। বহিরাগত এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক পন্ডিত আলোচনা করেছেন; এ বিষয়ে নৃতাত্বিকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীর সময় মুসলমানদের পক্ষে দাবী জানানো হয়েছিল— তারা দেশীয় মুসলমান নয় — সকলেই বাংলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তৎকালীন আদম সুমারীর কমিশার ই. এ. গেট সাহেব এ ব্যাপারে তদন্ত করে মন্তব্য করেছিলেন, পুরোনো দলিল দস্তাবেজ দেখে বাংলায় প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলিতে বিশেষত মালদহ, গৌড়, মুর্শিদাবাদ, আজিমাবাদ, জাহাঙ্গীর নগর, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বহিরাগত মুসলমানের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠী এ ধরনের কোনো প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ভূমিদান পত্র প্রভৃতির কিছুই তারা অধিকারী নয়। এরাই মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — এরা কোনো মতেই বহিরাগত নন। এরা এদেশের ভূমিপুত্র। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা দেশজ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে দর্মান্তরিত— তা বোঝা যায় এদের আচার ব্যবহার, লোক - বিশ্বাস, সংস্কারগুলি পর্যালোচনা করলে। কৌলিক আচার অনুষ্ঠান হিন্দুদের সাথে এসব মুসলানদের মধ্যে খুব একটা বেশী পার্থক্য থাকতো না। নৃতাত্ত্বিক পূর্ববঙ্গের মুসলামানদের পাশে ঐ এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা বর্ণের মানুষদের সাথে তুলনামূলক নৃতাত্বিক পরিমাপ করেছিলেন— তাতে এসব সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের বিশেষ কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পান নি। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিরাকার সূচক এবং নাসিকার সূচক লক্ষ্য করে ড. অতুল সুর মন্তব্য করেছিলেন 'বাঙালী মুসলমান বাংলার অন্যান্য জাতির ন্যায় বিস্তৃত শিরষ্ক জাতি। উত্তর ভারতের দীর্ঘ শিরষ্ক জাতি সমূহের সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ খুবই কম ঘটেছে। এককথায় বাঙালী মুসলমান বাংলাদেশেরই ভূমি সন্তান, তারা আগন্তুক নয়।" নানাভাবে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর এই সংখ্যাধিক্যের কারণ খোঁজা হয়েছে— এ ব্যাপারে আমরা অন্যত্র এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করবো। আপাতত এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

'ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এতো বেশী কেন? একথা মুর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।... বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিত বর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই ইহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেই জন্য বাংলাদেশে যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।'

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন, পত্রাবলী-৭ম খন্ড, নভেম্বর ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬)।

মুসলমানদের জীবন চর্যায় নানা আচার অনুষ্ঠান রয়েছে, আকিকা, সুন্নত, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান তার জীবনকে ঘিরে রেখেছে। সে অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে হিন্দু সমাজের আদৌ কোনো ধারণা নেই বা মুসলমান সমাজের নানা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান— ইসলামী জলসা, কাওয়ালী, মিলাদ শরীফ অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন সব বাক্য, শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয় যা প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে না, বোঝার চেষ্টাও করেনা। সাহিত্যিকদের এ ব্যাপারে একটা বড় ভুমিকা থাকে। সৎসাহিত্য পারে অনেক জগদ্দল পাথর গুড়িয়ে দিতে, মনের আঁধার তথা সংকীর্ণতা দূর করে, তাকে উদার মানসিকতার রাজ্যে পৌঁছে দিতে পারে। সাহিত্যের আবেদন মানুষের মনের গভীরে— এবং তার মনের মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে সক্ষম হতে পারে। সাহিত্যের সাথে জীবনের গভীর সম্পর্ক; জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। শিল্পকলা, চারু কলা, সাহিত্য চর্চায় সংস্কৃতিতে ধর্মের একটা প্রভাব থেকে যায়। জীবনের কথা বলতে গিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ সমকালীন জীবনবোধ, তার গোষ্ঠী চেতনা, জাতি সম্প্রদায় ভাবনা, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা - দীক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছু এসে পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবনের জন্য উত্তরণ নিঃসন্দেহে সাহিত্যকে মহৎ করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের এক বিপুল সংখ্যক স্রষ্টা হিন্দু এবং বর্ণগত বিচারে উচ্চবর্ণ সম্ভুত হওয়ায় সমাজের তলাকার মানুষের জীবন চিত্র সেভাবে ফুটে উঠতে পারেনি— তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন— 'মেনে নিই সে নিন্দার কথা' আর মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বল্প উপস্থিতির জন্যও বটে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ একান্তভাবে উপেক্ষিত - মুসলমান জীবনের খন্ড চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে— সামাজিক ইতিহাসের বিচারে তা নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি।

বাঙালীর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদান কোনো মতেই অস্বীকার করা যাবে না। বঙ্গ সংস্কৃতিতে নানা প্রভাবের পাশে ইসলামী সংস্কৃতির এক ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রভাব তার ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্প, সঙ্গীতে, ঘর - গেরস্থালীতে, পোষাক - পরিচ্ছদে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, তার রন্ধনশৈলীতে, আচার - আচরণ জীবনযাত্রার নানা স্তর পরম্পরায়। এক কথায়— সামাজিক - রাজনৈতিক-ধর্মীয় জীবনে ইসলাম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় জীবনে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অবদান 'হিন্দু' শব্দটি। যদিও গ্রীকদের আমল থেকে এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় জনজীবনে এর ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এদেশে বসবাসের পর থেকে। আজকে প্রাচীন ভারতের একটি মাত্র ধর্মবোধক শব্দ হিসাবে 'হিন্দু' শব্দটি যে ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সে ভাবে ব্যবহৃত হতো না। হিন্দু শব্দটি ব্যবহৃত হতো সিন্ধু নদী - তীরবর্তী এলাকা বোঝাতে— ভৌগলিক পরিচয়ের শব্দ। হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরে নানা ধর্মমত— শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এভাবে নানা

মত ও পথে আজকের হিন্দুধর্ম সেদিন বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, আর্য, অনার্য, বৈদিক, অবৈদিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সব ধর্মমত মিলে মিশে একাকার হলো হিন্দু ধর্মে। সিন্ধু নদী তীরের আধিবাসীদের সে যুগে বিদেশীরা 'হিন্দু' বলতো, পরবর্তীকালে ভারতবাসী মাত্রে হিন্দু এবং তাদের ধর্মও 'হিন্দু' হিসাবে পরিচিত হলো। হিন্দুর জাতীয়তা গঠনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সেদিন এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যযুগে বাংলাদেশে নানা ধর্ম - বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মের পাশে নানা ষষ্ঠীদেবীর পূজা—এ ছাড়া ছিল আরও নানা লৌকিক দেবদেবী— পঞ্চানন্দ, ব্রহ্মদৈত্য, বাবা ঠাকুর। এর সাথে ছিল শাস্ত্র অনুমোদিত ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি -নির্ভর সংস্কার ও কৃত্য সমূহ যা সম্ভবত সেন রাজাদের আমল থেকে বেশী করে চালু করা হয়েছিল।

ভারতীয়দের আর্থিক জীবনে মুসলমান অধিকার নানা প্রভাব ফেলেছে। প্রাচীন ভারতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে হাট - হট্ট, এর এক বড় ভূমিকা ছিল। একটা নির্দিষ্ট দিনে হাট বসতো— দূর দূর থেকে মালপত্র হাটে বিকোনোর জন নিয়ে আসা হতো, বণিকরা দূর দুরান্ত থেকে বিভিন্ন হাটে এসে মাল সওদা করতো আর সেই সাথে সাধারণ মানুষের আর্থিক জীবনটা হাটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। কিন্তু মুসলমান অভিযানের পর তার আর্থিক জীবনটা গতি পেয়েছে — নতুন নতুন শব্দের আমদানী ঘটলো। বাজার, কসবা, সওদাগর, জাহাজ, মাল, খালাস, তালাস, আমদানী, রপ্তানী, বন্দর, দোকান, মুদিখানা, দরজি, পাল্লা, লোকসান, মন্দা, নমুনা, জমা, রসিদ - ফাজিল, খরচ, হিসাব নিকাশ, ফর্দ, বায়না, তহবিল, দাদন, সরবরাহ, তাগাদা ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ তার আর্থিক জীবনকে পুষ্ট করেছিল। মুসলমান অধিকারের মধ্যে দিয়ে আমাদের আর্থিক জীবনে গতি এলো। বিনিময় প্রথায় কড়ির পরিবর্তে মুদ্রার বহুল প্রচলন হতে দেখা গেল। মধ্যযুগে বাংলায় মুদ্রা তৈরীর জন্য মুসলমান সুলতানদের আমলে বিভিন্ন স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম মুসলমান আক্রমণকারী ইখতিশউদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী তার বিজয় অভিযানকে স্মরণীয় করার জন্য যে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন সেই মুদ্রার এক পিঠে আরবী অক্ষরে লেখা বখতিয়ারের নাম।' অপর পিঠে সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে 'গৌড় বিজয়'। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তখন বাংলাদেশ কথাটি বাঙলা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না তা ধরে নেওয়া যায়। অসংখ্য আরবী - ফারসী শব্দ, প্রবাদ - প্রবচন — বাক্য ব্যবহার প্রণালী, নানা রকমের শব্দ গঠন প্রণালী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলো খুবই—তা আমরা মধ্যযুগেই লক্ষ্য করেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উদ্ভবের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এর অসামান্য অগ্রগতি আমাদের সামনে - প্রতিষ্ঠিত হলো— ইসলাম অভিযান এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বাঙালীর পোষাক রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের পোষাক; আমাদের বেশ - ভূষার ক্ষেত্রে ইসলামী প্রভাবের মূর্ত প্রতীক। প্রাচীনকালে বাঙালী পুরুষের পোষাক, গায়ে উত্তরীয় - ধূতি আর কাঠনির্মিত পাদুকা। মহিলাদের একমাত্র শাড়ী। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা পেশার মানুষের কথা আমরা জানতে পারি, দরজি পেশার কোনো মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেদিন মানুষ পূজা পার্বণ উৎসবের দিন নতুন বস্ত্র পরিধান করতো, কিন্তু সেলাই করার রীতি ছিল না। জামা, মোজা, পিরাণ, কামিজ, শায়া - কিংখাব, শাল, মখমল, আলোয়ান— সবই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে— বাঙলায় এসেছে। উচ্চবিত্তের মানুষের গরীব মানুষের পোষাকে পার্থক্য ছিল, গরীবরা সামান্য পরিধেয় বস্ত্র জোগাড় করতে পারলেই খুশী হতো। মধ্যযুগের এক ভ্রমণকারী গরীব মানুষের পোষাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - 'The Common People go almost naked. They wore nothing but a piece of linen, wrappad round the waist or passed between the legs'

(L.S. Stavorinus - Voyage to the East Indies, Translated by Samuel Hull. -1778, vol. 1, Page - 414-15)

হিন্দুদের পোষাক ছিল ধূতি, মুসলমানের তহরণ, কুর্তা, পাগড়ী। মুসলমান মেয়েরা শালোয়ার, কামিজ, ওড়না ব্যবহার করতো। অভিজাত মুসলমান মহিলারা বোরখা ব্যবহার করতো। মেয়েদের নামাজ করার জন্য এমন পোষাক দরকার — নামাজের বিভিন্ন অঙ্গ পূর্ণ করার জন্য পোষাক দেহের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দরকার। সেক্ষত্রে সালোয়ার - কামিজ মহিলাদের পোষাক হিসাবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। মুসলমানরা মাথায় চুল ছোট রাখত, মুখে দাড়ি, অনেকে মাথায় সব সময় টুপি রাখত। আশরফদের পোষাকের অভিজাত্য থাকলেও সাধারণ হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে খুব একটি পার্থক্য চোখে পড়তো না। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি মিলে মিশে— একাকার। মনের কামনা বাসনার শুধুমাত্র ধর্মকর্মের মধ্যে দিয়েই নিষ্পত্তি ঘটে না— দৈনন্দিন জীবনচর্যা, তার পোষক পরিচ্ছেদ, ঘর - গেরস্থালী, খাদ্যাভ্যাস, খেলাধুলা, গান - বাজনা— প্রতিটি ব্যবহারিক জীবনের কৃতকর্মের মাধ্যমে তার সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে, আর এই সংস্কৃতির বিচারে হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম — বরং মিলের পরিমাণটাই বেশি।

খাল বিল নদী নালার দেশ বাঙলাদেশ। মাছ ও ভাত বাঙলীর দৈনন্দিন জীবনের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু বৈষ্ণবকে বাদ দিলে খাদ্যাভ্যাসের বিচারে সমগ্র বাঙালীর মধ্যে এক গভীর ঐক্য। বাঙলার খালে বিলে নদী নালাতে নানারকমের মাছ, বহু বিচিত্র তাদের স্বাদ। হিন্দু - মুসলমান সকলের প্রাত্যহিক জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আহার্য সংগৃহীত হয় মাছ থেকে। সেই সুদূর অতীতে বাঙালীর সাথে মাছের এই সম্পর্কের কথা আমরা জানতে পারি নানা কাব্য কবিতার মাধ্যমে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রীধর দাসের সংকলিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত' -এ অভিনন্দের মাছ সম্পর্কিত একটি কবিতা — 'শফর সংহর চঞ্চলতা মিমাং চিরমগাধজল প্রণয়ী ভব। ইহহি কেমল বঞ্জুসল জালকে বসতি দুষ্ট বকোট কুটুম্বকম্'।

(হে শফর, এই চাঞ্চল্য ত্যাগ করে অগাধ জলে আসক্ত হও। এই কোমল বেতসকুঞ্জে বক কুটুম্ব বাস করে)।

'ওগগর ভত্তা রম্বঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা, দুগ্ধ সজুত্তা।।
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্চা।
দিজজই কন্তা, খাঅ পুণ্যবন্তা।।'

(ওগরা ভাত কলাপাতার ঢালা, গব্য ঘৃত সুস্বাদু দুগ্ধ, মৌরল্যা মাছ, নলতে শাক রন্ধন করলেন কান্তা। দিচ্ছেন কান্তকে আহার করেছেন পুণ্যবান)।

মধ্যযুগের এক কবি বাঙালীর রসনা তৃপ্তির এই মাছের বিভিন্ন পদের বর্ণনা দিয়েছেন—

কাতালের কোল ভাজে মাগুরের চাকি
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি।
পাবদা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের ঝোল।

এর সাথে নানারকমের শাক, সবজি, তিতো জাতীয় তরকারী, উচ্ছে - করলা - নিমপাতা দিয়ে শুক্তো, অম্লজাতীয় ফল দিয়ে অম্বল, খাটা, বাঙালীর প্রিয় খাদ্য - এজন্য চাতলা, তেঁতুল, কুল, কামরাঙা, আমড়া, কদবেল, রুচিআম, করঞ্জা সব কিছু বাঙলার

নিজস্ব ফল।

মধ্যযুগ থেকেই দুই ধর্মের মানুষের মধ্য সখ্যতার পাশাপাশি বিভেদও রয়ে গেছে। চৈতন্য মঙ্গলের কবি জয়ানন্দ লিখেছেন 'ব্রাহ্মণ যবনের বাদ যুগে যুগে আছে।' মধ্যযুগের আবহাওয়ায় সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও চেতনা প্রাধান্য লাভ করতো। অপর সম্প্রদায়ের উপাসনা, প্রণালী, রীতি নীতিকে চাচ্ছিল্য প্রকাশ করেই নিজ সম্প্রদায়ও ধর্মকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার প্রচেষ্টা চলতো। কৃত্তিবাস কবিরাজও নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ্য করতে গিয়ে এই পথের পথিক হয়েছেন। কেবলমাত্র কৃত্তিবাস কবিরাজ নন, অন্যান্য কবিরাও কমবেশী এই পথ অনুসরণ করেছেন।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি মুকুন্দরাম বাস্তববোধ ও বাস্তব - দৃষ্টির জন্য সে যুগের পক্ষে অগ্রগামী কবি হিসাবে শ্রদ্ধালাভ করেছেন কিন্তু তার মধ্যেও এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু কিছু পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। মোল্লাদের লোভ, হিংসার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে মন্তব্য করেছেন— তারা 'ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।' তারা অর্থগৃধ্নু বললে 'মরগী জবাই করি কড়ি ও খালি জবাই করি মাথা নেন।' মোল্লাদের চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'তারা কেহ নিকা কেহ করে বিয়া'।

'দুই পত্নী দুই দিগে সুখে নিদ্রা যায়
এই মতে সুখে বঞ্চে দাউদ বাশায়।'

ইসলামে একাধিক শ্রী গ্রহণ শাস্ত্র অনুমোদিত হলেও এক শয্যায় একাধিক স্ত্রী নিয়ে শয়ন শাস্ত্র সম্মত নয়। এটা পাপ বলে পরিগণিত হয়। রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র মুসলমান সমাজের তালাক ও বিবাহ সম্পর্কে চূড়ান্ত অসম্মানকর মন্তব্য করেছেন— জনৈক মুসলমান নারী বলেছে—

'বছর পনের ষোল বয়স আমার
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার।'

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কবির চূড়ান্ত মন্তব্য বিভিন্ন স্থানে তাঁর কাব্যে আমার লক্ষ্য করি।

এই বিভেদ -এর পাশে সখ্যতার কথাও আছে। এই বিভেদ ও মতান্তর দূর করে সমসাময়িক উদার দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার কথা বলেছেন কবীর, দাদু প্রমুখ সাধু সন্তরা। কবীর বলেছেন— বেদ কোরান ভববন্ধন স্বরূপ, ওসবের ভেতর তুমি কেবল ঘুরপাক খেয়ে মরবে। দাদু বলেছেন— 'হিন্দু মুসলমান দুটি হাত, এই দুটি হাত একত্রিত না হলে অমৃত রচিত হবে না। অমৃত পান করা যাবে না।' এঁদের এই মহান আদর্শ কার্যকরী হয়নি। বেদ পুরাণ বিধি বিধান গ্রহণযোগ্য না হলে উপায় কি, সে সম্পর্কে বাস্তব গ্রাহ্য কোন বিধান এঁরা রেখে যেতে পারেন নি। এঁদের বাণীতে ক্ষণকালের জন্য মানুষের মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে কিন্তু চিরকালীন সমাধান তো পাওয়া গেল না!

এই উপলব্ধিকে সমাজ জীবনে সার্থক করা যাবে কি উপায়ে সে সম্বন্ধে তেমন কোনো নির্দেশ না-পাওয়ার ফলে প্রাচীন চিরাচরিত পন্থাই তাদের রয়ে গেছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধ, মিলন সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ঐক্য অনৈক্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি চেতনা বহমান ছিল। সমন্বয় না ঘটলেও উভয় সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে নানা দিকে, একে অপরকে প্রভাবিত করেছে, বিভেদের রেখা থাকলেও তার মধ্যে মিলনের সুরও লক্ষ্য করা গেল। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু - মুসলমান পাশাপাশি বসবাসের মধ্য দিয়ে নানা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল তা স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তীব্র বিষ উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। বাঙলার ক্ষেত্রে বঙ্গ - ভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে তা উর্বর ক্ষেত্র পায়। মুসলমান সমাজের তলাকার মানুষেরা শিক্ষা বর্জিত আর্থিক দুর্দশার চূড়ান্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটিয়েছে। পরাধীন বাংলার রাজশক্তির সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অভিজাত মুসলমানরা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে মনে করেছিল ইংরেজ রাজত্ব সাময়িককালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— অনতিবিলম্বে এই শক্তির পতন ঘটবে। তাই এক ধরনের নৈরাশ্য, হতাশা ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রথমযুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিকে সে অস্বীকার করেছে। ধর্মীয় নেতারা, আলেমরা দারুল ই হারব -এর কথা ভেবে ইংরেজ রাজত্বের সব কিছুতেই বিরোধিতা করেছে ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। ফলে ধীরে ধীরে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী সুযোগ - সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের নেতারা বুঝেছেন চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন দরকার। সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলন মুসলমান সমাজ অভ্যন্তরে নতুন চিন্তার সুত্রপাত ঘটায়।

মুসলমান সমাজের মানুষরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে; সরকারী বিভিন্ন চাকুরীতে তারা অংশ গ্রহণ করতে থাকে কিন্তু দীর্ঘ দেড়শ বছরের পশ্চাদপদতায় তারা তার প্রতিবেশী হিন্দু - সমাজের পাশে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি। নিজেদের পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য ধর্মকে অবলম্বন করে রাজনীতি করতে চেয়েছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে : মুসলমান সমাজ সদম্ভে ঘোষণা করেছে 'লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তান'। তারই প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে জেগেছে—

ক) জবজব হিন্দু জাগা হ্যায় দেশমে মোল্লা ভাগা হ্যায়।

খ) মুসলমানকো দুনো স্থান, পাকিস্তান আউর কবরস্থান। আবার উল্টোটা হতে পারে; দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক জগতে হিন্দু - আধিপত্য তাদেরকে বিরোধিতার পথে যেতে সাহায্য করেছে। হিন্দু সমাজের একাংশ মুসলমানদের পাকিস্তানকে বিদ্রুপ করে তার সমার্থক হিসাবে কবরস্থান -এর উল্লেখ করেছে। উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, ধর্মীয় সংঘর্ষ ঘটেছে সমগ্র ভারত জুড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো দুটি রাষ্ট্র ঃ ভারত ও পাকিস্তান। পরবর্তীকালে ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান (পাকিস্তানের পূর্বাংশ) বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ তৈরী করেছে। ধর্মই কোন জাতির একমাত্র বন্ধন হতে পারে না, উভয়ের সংস্কৃতির ঐক্যের দরকারও। পাকিস্তানের এ ঘটনা তা প্রমাণ করেছে — তা অন্য প্রসঙ্গ, অন্য বিষয়। ভারত পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। নানাভাবে সেদিন ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল— ধর্মের রঙে তার সংবিধান রচনার। হিন্দী - হিন্দু - হিন্দুস্থান স্লোগানের আড়ালে ভারতকে হিন্দু - রাষ্ট্র - ঘোষণার দাবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সংবিধান রচিত হলো সেদিন। সে এক ঐতিহাসিক অগ্নিপরীক্ষার দিন। আমাদের জাতীয় নেতারা, সংবিধান প্রণেতারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার অর্থ শতাব্দীর সময় সীমায় অসংখ্যবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছে, দাঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে মানুষ। সুতরাং এই প্রশ্ন আজো রয়ে গিয়েছে এর থেকে পরিত্রাণের পথকি? এটা কি চলতেই থাকবে?

(সৌজন্য ঃ 'সাথী হাতিয়ার')